যুগ-সমস্যা

ভূতপূর্ব্ব যুগান্তর সম্পাদক

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

এম, এ, পি, এইচ, ডি,

আট আনা

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস

১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

——কলিকাতা——

প্রকাশক
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা—
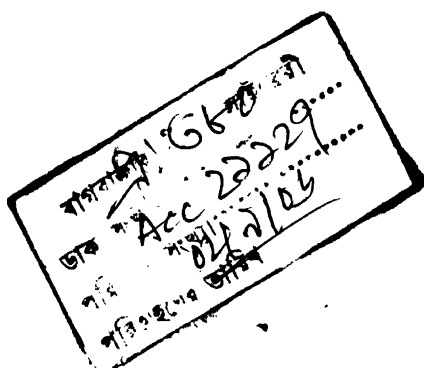
প্রিণ্টার—
শ্রীমানগোবিন্দ দে
প্রফুল্ল প্রেস,
৫৩ এ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভুমিকা

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দেশ এবং বিদেশ হইতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা লিখিয়াছিলেন সেইগুলি একত্রিত করিয়া 'যুগ-সমস্যা' প্রকাশিত হইল। যদিও কতকগুলি লেখা অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং কতকগুলি পরে কিন্তু তথাপি প্রত্যেক লেখার ভিতর তাঁহার একটি সামঞ্জস্য আছে অর্থাৎ তাঁহার নিজের একটি বক্তব্য আছে। দেশ বিদেশের বাস্তব-রাজনীতির অভিজ্ঞতা যে কয়জন ভারতবাসীর আছে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহাদের অন্যতম। মোটামুটি তিনি যে সমস্ত বিষয় বলিতে চান প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা ভাবিবার বিষয়। ১ম—ধর্ম্মের উপর রাজনীতি স্থাপন না করিয়া সামাজিক ও আর্থনীতিকের উপর স্থাপন কর। ২য়—'গণবৃন্দকে' ধর্ম্মের নামে মাতাইয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিও না; তাহাদের ন্যায্য দাবী তাহাদিগকে দাও নচেৎ দু'দিন পড়ে শ্রেণী-বিবাদ অনিবার্য্য। ৩য়—যুবকগণকে তিনি বলিতে চান যে তোমরা বড়লোকের তল্পিদারি হইয়া ভারতের স্বাধীনতার পথে

অন্তরায় হইও না।] বড়লোক দু'পয়সা তোমাদিগকে দিয়া তাহাদের স্বার্থ সাধন করিয়া লইবে পরে তোমাদের ত্যাগ করিবে, তখন তোমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। এক কথায় হে স্বদেশীয় যুবকগণ, ক্ষণিক সুখের জন্য বড়লোকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা হইও না—তোমাদের জীবন মহৎ, তোমাদের ভবিষ্যৎ মহৎ, তোমরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ভারতের সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিও। মনে থাকে যেন বর্ত্তমান ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্টা তোমরাই করিয়াছ। ৪র্থ—রাজনীতির একটি ক্রমবিকাশ আছে সেইটি কেহই লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে না। রুষিয়ার ইতিহাসই ইহার জলন্ত উদাহরণ। গণবৃন্দের জাগরণ ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব, অতএব এক্ষণে ইহাই যুবকবৃন্দের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন। পুস্তক প্রকাশে যদি যুবকবৃন্দরা তাহাদের অবস্থা ভাবিতে চেষ্টা করে তাহলে পুস্তক প্রকাশ সফল মনে করিব।

কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। } শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুগ-সমস্যা

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও
ইতিহাসের শিক্ষা

আজকাল যুবকদের মধ্যে একটা অবসাদের ভাব দেখা যাইতেছে। অনেকের মুখে হতাশের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোন প্রকারের জাতীয় কর্ম্মে আর আগ্রহান্বিত নহে। আর একদল কর্ম্মীযুবক উপযুক্ত কর্ণধারের অভাবে লক্ষ্যহীন তরণীর ন্যায় জনকতক পেশাদার রাজনীতিকের পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন এই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকদের হুকুম তামিল করিলেই দেশমাতৃকার সেবা করা হয়। তাঁহারা হয়ত অজ্ঞাত-সারে অপরের দ্বারা চালিত হইতেছিলেন, কিংবা ইহাও

হইতে পারে যে, কেহ কেহ জ্ঞাতসারেই ইহা করিতেছেন। তাঁহারা দেশের সেবার ভাণে কোন কোন "মুরুব্বি" রাজনীতিকের "তল্পীদার" হইয়া হয়ত ভাবেন যে ইহাদ্বারা নিজের কাজ গুছাইয়া লইবেন। ফলে যুবকবৃন্দের মধ্যে সাধারণভাবে গঠনমূলক জাতীয়কর্ম্মে উদাসীনতা বিরাজ করিতেছে।

[জগতের ইতিহাসে ইহা দেখা যায় যে, কোন একটা বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনের বিফলতার ফলে দেশমধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। আদর্শ যত বড় হয়, কর্ম্ম যত মহান হয়, নিস্ফলতার ফলে তাহার প্রতিক্রিয়াও তত ভীষণ হয়। সাধারণের মধ্যে যে প্রকার অবসাদের ফলে হতাশের ভাব আসিয়া পড়ে, লোকে আদর্শের প্রতি উপেক্ষা করে, পূর্ব্বেকার কর্ম্মীদের মধ্যেও তদ্রূপ নানা প্রকারের বিশৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। কেহ কর্ম্মের ভাণে, পূর্ব্বাদর্শের ছায়ায় দাঁড়াইয়া স্বকার্য্য সাধন করে, কেহবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কি করিবেন বা করিতেছেন তাহা না বুঝিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দেন। এই সময়ে দলাদলি, ব্যক্তিগত গালাগালিতে দেশ

মুখরিত হয়। পুরাতন কর্ম্মীরা নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া পরস্পরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে। যাহারা এ মন্তব্যের সত্যতায় সন্দেহ করেন, তাঁহারা রুষ ও জার্ম্মাণীর ১৯।২০ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহার প্রমাণ দেখিতে পারেন। ভারতবর্ষে, বর্ত্তমান সময়ে দুইটি বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনের নিস্ফলতার ফলে সেই অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না; যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন যে, তাহার জের এখনও মিটে নাই। এস্থলে বাঙলা দেশের কথাই বলি, এই দলাদলি, গালাগালির ফলেই দেশময় আজ নৈরাশ্য ও অবসাদ আসিয়াছে।]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে একটা বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যায়। ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে জনবৃন্দ হয় বিদেশীর শাসন হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস করে, অথবা স্বদেশের ধনী শ্রেণীর শাসন হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করে। এই সময়ে, "নব্য ইটালী" "নব্য ইউরোপ" প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়, আবার এই অসময়েই কার্ল-

মার্ক্স, বাকুনীন প্রভৃতি নানাপ্রকারের গণতন্ত্র প্রচারক আবির্ভূত হন। এই সময়ে জার্ম্মাণভাষী দেশসমূহের বৈপ্লবিকেরা একটা বড় আদর্শ লইয়া দণ্ডায়মান হন। তথাকার বুরজোয়াশ্রেণীর পণ্ডিত বৈপ্লবিকেরা আদর্শানুসারে বুরজোয়া-ন্যাশন্যালিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল আভিজাত্যশ্রেণীর যথেচ্ছাচারী শাসন হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া একটা সাম্যবাদসঙ্গত নিয়মতন্ত্র স্থাপন করা; কিন্তু তখন মার্কস্ ও বাকুনীনের দল গণতন্ত্র অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যতন্ত্র স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন বলিয়া এই মডারেট ন্যাশন্যালিষ্টদল নিজেদের "সোসায়্যালিষ্ট" বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু যখন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই সব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ হইল, তখনই প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। ইহারই ফলে জার্ম্মাণ বৈপ্লবিক ও ন্যাশন্যালিষ্টের দল নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল ও দেশে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিষ্ফল করিয়া দিল। বিদেশেও সেই ঝগড়ার জের মিটে নাই! বৈপ্লবিক পলাতকেরা আমেরিকায় গিয়াও সেই আত্ম-

দ্রোহ চালায়, তাহার ফলে আমেরিকায় জার্ম্মাণ জাতির নামে ঘোর দুর্ণাম হয়। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধের ফলে বিসমার্ক জার্ম্মাণীতে একজাতীয়ত্ব গঠন করিয়া একটা পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের স্থাপন করিলে এই দুর্ণাম ঘুচে।

রুষিয়াতে এই অবস্থা দুইবার হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কাদার গেপোর বৈপ্লবিক নিষ্ফলতার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তাহার ফল অতি ভীষণ হইয়াছিল। এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সময় (রুষেরা ইহাকে প্রথম বিপ্লব বলে) ইম্পিরিয়ালিষ্ট দল ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারের রাজনৈতিক সম্প্রদায়েরা একত্র হইয়া বিপ্লবের ধ্বজা উড্ডীন করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে, যুবকের দল কাজ না পাইয়া সমগ্র শক্তি আত্মকলহে ব্যয় করে। একদিকে যেমন রাজশক্তি কঠোর ভাবে তাহাদের দলনে প্রবৃত্ত হইল, অন্যদিকে হাতে কোন কাজ না থাকায় যুবকবৃন্দ নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং ঝগড়া করাকেই কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। আর যে সব বৈপ্লবিক যুবক পুলিশের হাত হইতে স্বীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে প্রবেশ

করে, তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া শেষে পুলিশেরই খয়েরখাঁ হইয়া স্বীয় বৈপ্লবিক বন্ধু ও সহযোগীদের ধরাইয়া দিতে লাগিল। যাহারা অগ্রে স্বাধীনতার নামে জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল, তাহারাই আদর্শ বিহীন হইয়া ও পন্থা হারাইয়া গৃহশত্রুতে পরিণত হইল। এই সময়কার রুষের কর্ম্মীদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি ভীষণ হইয়াছিল, এবং পাছে ভারতবর্ষেও এই প্রকারের কার্য্যের ফলে এরূপ অবস্থা বৈপ্লবিকদের মধ্যে আসে, তাহার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স ক্রপ্টকিন তাঁহার কোনও বিশিষ্ট আমেরিকান মহিলা বন্ধুর দ্বারা ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। এই মহিলা বিশেষ ভাবে ভারতবন্ধু, তিনি ঐ সময়ে ইহা আমাকে আমেরিকায় বলিয়াছিলেন, আর বর্ত্তমান সময়ে বল-সেভিক বিপ্লবের পরে যে সব রুষীয় দল প্রথমোক্তদের সহিত মিলে নাই বরং তাহাদের শত্রুতা সাধন করিয়া-ছিল, তাহারা আজ বিদেশে বিতাড়িত হইয়া পরস্পরে দলাদলি ও কাটাকাটি করিতেছে, এবং বলসেভিক বিপ্লবকে নিষ্ফল করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে এবং

গোপনে এখনও করিতেছে। ইহাদের দলাদলির উদ্দেশ্য ইহাই বুঝা যায় যে, বিপ্লবের ফলে তাহাদের দল রাজতক্তে অধিষ্ঠিত না হইয়া বলসেভিকেরা কেন সে-স্থলে বসিল। ইহাদের সকলেরই প্রকৃত আদর্শ যে, রুষজাতিকে অভিজাত ও পুরোহিতবর্গের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন হইতে বিমুক্ত করা; কিন্তু তাহা ভুলিয়া গিয়া, এখন দলাদলি ও ব্যক্তিগত আক্রোশই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। [মনোস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই দেখা যায় যে, এই সব ঝগড়ার মূলে ফলতঃ একটি কথা রহিয়াছে তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত স্বার্থ! carrierism-ই হইতেছে এই সব কলহের মূল।]

শুনিয়াছি নির্ব্বাসনাবস্থায় বলসেভিকেরাও এইরূপ ঝগড়া করিয়া পরস্পরের বিনাশ সাধন করিবার প্রয়াস পাইত। বিপ্লবের পর লেনিন তাহাদিগকে স্বদেশে আনয়ন করিয়া এক একটি বড়পদে স্থাপন করিলে সেই কলহের নিরাকরণ হয়!

[জগতের কোনও জনহিতকর আন্দোলন কয়েকজন

ভাবুকের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। আর সাধারণ লোকে তাহা mob-psychology-এর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গ্রহণ করে। যতক্ষণ স্বার্থশূন্য ও ত্যাগী লোকদের দ্বারা এই সব আন্দোলন চালিত হয়, ততক্ষণ তাহা আদর্শ ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু শেষে এই আন্দোলন নিষ্ফল হইলে উপযুক্ত নেতা ও কার্য্যের অভাবে একটা ভীষণ প্রতি-ক্রিয়ার উদয় হয়। সেই সময়ে নানাপ্রকারের লোক যাহারা প্রথমে নিজেদের 'অহংকে' খর্ব্ব করিয়া রাখিয়া-ছিল, তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে 'সোসালিষ্ট' হইয়া পূর্ণভাবে Carrieriest-রূপে পরিণত হয় এবং যাহারা গড্ডলিকা প্রবাহে পূর্ব্বে গা ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহারা স্বীয় স্বার্থের জন্য এই সব Carrieristদের তল্পীদার হয়। এই জন্যই দলাদলি ও ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।

এইরূপ সামাজিক দুর্গতির সময়ে একটি মহৌষধি আছে, তাহা নূতনাদর্শ দেখাইয়া কর্ম্মীদের নূতন প্রকারের কর্ম্মপদ্ধতিতে প্রবৃত্ত করা। ইতিহাসই এই মহৌষধির পরিচয় দিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর
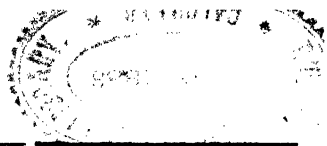
জার্ম্মাণীর কর্ম্মীদের মধ্যে এইরূপ কলহের পর একজন লোক আবির্ভূত হন যিনি একটি নূতন কর্ম্মপদ্ধতি প্রদান করেন। তাঁহার নাম লাসাল (Lasalle), ইনি এক-জন সোসালিষ্ট এবং জার্ম্মাণীতে শ্রমজীবী সঙ্ঘ প্রতি-ষ্টানের স্থাপনকর্ত্তা। ইহার পূর্ব্বে কার্ল্ মার্কস্ ও এন্‌গলস্ সোসালিজম্ প্রচার করিয়াছিলেন ও শ্রমজীবী-দের মধ্যে কিছু কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। লাসাল বাবুর দল ছাড়িয়া জনসাধারণকে তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন। অবশ্য তিনি বিসমার্ক দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া বলেন, ভাবুকদের চিন্তা-প্রণালী ও শ্রমিকদের শ্রম একত্রিত করিয়া তাহার সমবায়ে গণসমূহকে অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত কর। তিনি জার্ম্মাণীর কর্ম্মীদের বলেন, যাও গরীব ও শ্রমিকদের মধ্যে, তাহাদের শিক্ষিত কর, তাহাদের স্বীয় স্বার্থের বিষয়ে প্রবুদ্ধ কর, উপর হইতে নীচে যাইয়া পতিতদের উদ্ধার কর।

লাসালের এই কর্ম্মের ফলেই জার্ম্মাণীর প্রবল পরাক্রান্ত Social-democratic Party-র (সামাজিক সাম্যবাদি দল) গঠন হয়, যাহা বিসমার্কের Police State ধ্বংস করিয়া বর্ত্তমানের নব জার্ম্মাণীর ভিত্তিস্থাপন করে।

রুসিয়াতে যখন নানা-প্রকারের আদর্শ পন্থার কলরবে দেশ মুখরিত হইতেছিল, যখন সকলে—আসল যে কাজ নিরক্ষর রুষজাতিকে আভিজাত্যবর্গের নিষ্পীড়ন ও লুণ্ঠন হইতে মুক্ত করা—তাহা ভুলিয়া, কেবল মতের পার্থক্য হইতে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও তাহা হইতে দলাদলিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল, যখন নারোদ নিকির (সাধারণী) দল বোমা ছুঁড়িয়া মুজিককে (কৃষক) মুক্ত করিতে পারিল না, যখন প্রত্যেক পন্থার প্রবর্ত্তক স্ব স্ব প্রধান হইয়া নিজেকে নিষ্পীড়িত রুষ-জাতির উদ্ধার কর্ত্তারূপে মনে করিতেছিল, তখন একজন প্রখরবুদ্ধি পণ্ডিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক একটি নূতন আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া লোক-মধ্যে আবির্ভূত হন। ইঁহার নাম প্লেখানফ। ইঁহারই "গুরুমারা চেলা লেনীন্।" ইনি জার্ম্মাণীতে অবস্থান-

কালে কাল মার্কসের দর্শনশাস্ত্র ও তথাকার শ্রমিক-সঙ্ঘের সহিত পরিচিত হন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি স্বাধীনতার কর্ম্মীদের পূর্ব্ব পদ্ধতির ভুল বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন বুর্জোয়া যুবকেরা গুপ্ত সমিতিই করুক বা বোমাই ছুঁড়ুক তাহাতে রুষের গণবৃন্দ মুক্ত হইবে না। তিনি নিজেও প্রথমে গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন পরে সে সম্পর্ক ত্যাগ করেন ও তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতির প্রতিবাদ করেন। ইনি বলেন, 'বাবুর দল' জাতিকে মুক্ত করিতে পারিবে না। চাই কর্ম্মীর দল, যাহারা শ্রমিকদের মধ্যে গিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। রুষের ভবিষ্যৎ গণবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপে ইনি একটি নূতন আদর্শ ও নব কর্ম্মপদ্ধতির প্রচলন করেন। ইহারই ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক ও শ্রমিকদের শ্রম সম্মিলিত হইয়া নবীন রুসিয়ার সৃষ্টির চেষ্টা হয়, যাহার ফলে আজ নবীন রুসিয়ার অভ্যুত্থান।
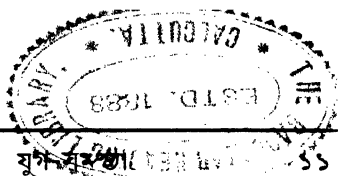
পূর্ব্বে রুসিয়াতে নারোদ নিকির দল ভাবিত terrorism দ্বারা আভিজাত্যবর্গের শাসন ধ্বংস

করিবে এবং এই মত ছাত্রবৃন্দমধ্যে প্রচার করা হয়। তখন সোসালিষ্ট মতবাদ রুষে দৃঢ় হয় নাই, কাজেই যুবকদের মধ্যে অন্য আদর্শ ছিল না। তখনকার মত ছিল যে যুবক ছাত্রবৃন্দই রুষে অভিলষিত নবযুগ আনয়ন করিবে। কিন্তু যুবক ছাত্রের দল দেখিল যে, তাহাদের পন্থা দ্বারা আর হালে পানি পায় না। তখন তাহাদের মস্তিষ্কে এই নব ভাবের উদয় হইল যে, রুষ কৃষিপ্রধান দেশ, তজ্জন্য মুজিকদের (কৃষক) সঙ্ঘবদ্ধ না করিলে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারা যাইবে না। ছাত্রেরা তখন গ্রামে গিয়া কৃষকদের মধ্যে কর্ম্ম করিতে লাগিল কিন্তু বিড়ম্বনা এই যে, ছাত্রের দল সহরের বাবু, তাহারা কৃষকের মনোভাব ও তাহার ধরণধারণের বিষয় সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, কাজেই চাষার দল এই সহরের বাবুদের বক্তৃতা শুনিল না, বরং তাহাদের তাড়াইয়া দিল। ইহার ফলে ছাত্রের দল সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কৃষক মনোবৃত্তি সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করে। শেষে চাষার বেশ পরিয়া, চাষার আচরণ অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও তাহাদের শিক্ষাদান

করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই যুবক ছাত্রেরা চাষার মনকে অধিকার করে

এখন ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙলাদেশে যে পূর্ব্ব কথিত মানসিক অবস্থা বর্ত্তমান, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। এ প্রদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন নিষ্ফল হওয়ার পরে একবার এই প্রকার অবসাদ আসিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, গালাগালি, পরস্পরকে সন্দেহ ইত্যাদি, বৈপ্লবিক যুবকবৃন্দের মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। তৎপর অসহযোগ আন্দোলন নিষ্ফল হইবার পরে আবার দলাদলি, নেতৃত্ব ইত্যাদির জন্য ঝগড়া যুবক কর্ম্মীদের মধ্যে আসিয়াছে।

এখন একদল যুবক কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় ভাসিতেছেন, অনেকেরই কাজ হইয়াছে ধনী রাজ-নীতিকদের তল্পীদার হওয়া ও তাহাদের জন্য ভোট সংগ্রহ করা। আর যাঁহারা এসব কর্ম্মে ব্যাপৃত নন তাঁহারা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার (mysticism) আবরণে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতেছেন। ইতহাস পুনরাবৃত্তি করে, সমান অবস্থায়

সমান ভাবের জিনিষ সমান দশা প্রাপ্ত হয় ইহা একটি সমাজতাত্ত্বিক সত্য। অন্যদেশেও এইসব অবস্থায় যে ফল প্রসূত হইয়াছে, ভারতেও তাহার অন্যথা হইতেছে না। পরস্পরের প্রতি আক্রোশ, দলাদলি, তল্পীদারি প্রভৃতির পশ্চাতে "ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা" নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু আশার কথা এই যে, এপ্রকারের অবস্থা বেশী দিন থাকে না। নূতন আদর্শ লইয়া নূতন কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া নূতন লোক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এসব অবসাদ, এসব দলাদলি, এই খাঁটির নামে মেকি চালানোর চেষ্টা—সব অন্তর্ধ্যান করিবে। এখন চাই নূতন আদর্শ ও নূতন কর্ম্মপদ্ধতি।

আমাদের চিন্তাশীল শ্রেণীকে (Intelligentsia) এই সত্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, কোন দেশেই জাতীয় মুক্তির জন্য আন্দোলন চিরকাল ধনী বা অবস্থাপন্ন শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত থাকে না; জাতীয় প্রতি-ষ্ঠান গুলি যদি যথার্থ ই "জাতীয়" নামের সার্থকতা রাখিতে চায়, তাহা হইলে সেইগুলি এই ধনীদের "উন্নতির সোপান" হইলে চলিবে না। আর শিক্ষিত

যুবকবৃন্দের ইহাও বুঝা উচিত যে জনকতক ধনীদের হস্তে খেলার পুতুল হওয়া "জাতীয় মুক্তির জন্য কর্ম্ম নহে"। মেকি জিনিষ একদিন ধরা পড়িবেই। ভারতের ইতিহাস জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের পন্থা অন্যপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। যুবকদের ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

যদি জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে সফল করিতে হয়, তাহা হইলে নূতনভাবে নূতন প্রণালীতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নূতনভাবে প্রবুদ্ধ যুবক কর্ম্মীদের কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। এক্ষণে চাই মস্তিষ্ক ও শ্রমকে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ করা। আমাদের শিক্ষিত যুবক-কর্ম্মীদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং কৃষক ও শ্রমিক-দের একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। শিক্ষিত যুবকদের সম্পত্তিবিহীন দরিদ্র লোকদের গৃহে যাইয়া আশার কথা কহিতে হইবে, তাহাদের পতিত অবস্থা হইতে তুলিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের মানবের অধিকার ও দাবীর কথা বলিতে হইবে, তাহা হইলে জাতীয় আন্দোলন অন্যরূপ ধারণ

করিবে। বর্ত্তমানের আদর্শ, কোটী কোটী নিরক্ষর, নিষ্পেষিত দরিদ্র গণসঙ্ঘকে মানবের অধিকার দান করা, তাহাদের মুক্তির কথা বলা ও তজ্জন্য কার্য্য করা। ইহা না হইলে স্বরাজের আশা করা বৃথা।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা

বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে একটা অবসাদ আসিয়াছে, চারিদিক হইতে হা হুতাশ ধ্বনিত হইতেছে। উপস্থিত সময়ে কি কর্ত্তব্য, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, নানাবিধ জটিল সমস্যার মিমাংসা কি প্রকারে হইবে, এবং সর্ব্বশেষে স্বরাজ কিপ্রকারে পাইব, এই সব প্রশ্ন লোকের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছে। এ বিষয়ে কেহই কোন প্রকারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না এবং তজ্জন্য অনেকেই নিরাশায় মগ্ন হইতেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা ভুলিয়া যাই যে জাতীয়

জীবনের নানাবিধ প্রশ্ন নিরাকরণের জন্য কোন সরল রাজকীয় রাস্তা নাই, আমাদের অতি দুর্গম ও দুরূহ পথ দ্বারাই গন্তব্য স্থানে গমন করিতে হইবে এবং গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে অনেক সময় লাগিবে।

আমাদের জাতীয় জীবনে যখন নানাপ্রকার প্রশ্ন উঠিয়াছে অর্থাৎ যে সব প্রশ্ন পূর্ব্বে বীজরূপে অন্তর্নিহিত ছিল এক্ষণে যাহা প্রকাশ্যে মূর্ত্তিমান হইতেছে, তখন তাহাদের সমাধা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রশ্নগুলিকে "গোঁজা মিলন" দ্বারা মিটাইয়া দিলে তাহা দুই একদিনের জন্য অন্তরিত হইতে পারে কিন্তু তাহাদের মিমাংসা তদুপায় দ্বারা হয় না। আর এই গোঁজামিলনরূপ মিমাংসা ফাঁশিয়া যাইলেই হা হুতাশ করিয়া নিরাশ হওয়াও সমীচিন নয়।

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান দোষ যাহা লক্ষিত হইতেছে তাহা বোধ হয় এই—আমরা সর্ব্ব-বিষয়ে 'গোলে হরিবোল" দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে চাই! আমরা ভাবি, একটা সকার বকার চেঁচাইলেই বুঝি কর্ম্ম ফতে করিতে পারিব। এই জন্যই আসল

দ্রব্যটাকে না ধরিয়া হুজুগ, ঠিয়েটারি ও পুতুলা নাচের ন্যায় হৈ চৈয়ের অভিনয়গুলিকে গন্তব্য পন্থা ও সত্যকার কার্য্য বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করি; এবং এই সব রং তামাসার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার না হইলেই ভাবি আর বুঝি কিছু হইল না!

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জাতীয় জীবনের যে কোন অঙ্গের কার্য্যের পশ্চাতে একটা দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মের বা অনুষ্ঠানের হয় স্রষ্টারূপে নয় হোতারূপে ভাবুক মণীষিগণের উদয় হয়। তাঁহারা কোন একটি অনুষ্ঠানকে লোক সমাজে পরিচিত বা প্রচলিত করিবার জন্য বিচার করিয়া তাহার একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেন, পরে তাঁহাদের শিষ্যেরা তাহা কর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। ইউরোপে এইজন্য প্রত্যেক মতবাদের পশ্চাতে একজন প্রখর বুদ্ধিমান দার্শনিক আবির্ভাব হইয়াছেন। তৎস্থানে কোন একটি নূতন ভাব বা অনুষ্ঠানের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সূচনারূপে ভাব রাজ্যে একটি প্রবল বিপ্লব সাধিত হয়, নূতন ও মৌলিকচিন্তার ধারায় লোকের মস্তিষ্ক

আলোড়িত হয়, ভাবুকেরা কি, কেন, কাহার জন্য এই লইয়া চিন্তা করেন। এই চিন্তার ধারা ধরিয়া দার্শনিকেরা নিজের অন্তর্জীবনে ভাবের বিপ্লব সাধন করিয়া নিজেদের নূতন ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করেন ও তাহা কার্য্যকরী হইলে পরে সমাজ কর্ত্তৃক গৃহিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের পূর্ব্বে লোকের চিন্তার স্রোত বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। তাহার ফলে রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি নূতন আদর্শের উদয় হইয়াছিল। আর এই নূতন চিন্তার জের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, এবং তাহার ঢেউ আমেরিকান বিপ্লবে বিশেষভাবে প্রতিফলিত ও বিকশিত হইয়াছিল। ফ্রান্সে ফরাশী বিপ্লবের পূর্ব্বে ভাবরাজ্যে একটি ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। তৎ-স্থানের তৎকালীন মণীষিরা প্রত্যেক সামাজি রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা গুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয় ছিলেন। মানব জীবনের এমন কোন অঙ্গই ছিল না
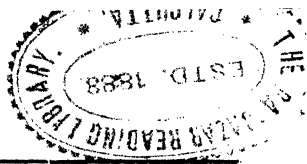
তাঁহারা স্বাধীন চিন্তা দ্বারা তাহাকে তর্কাধীন করিয়াছিলেন ও নির্ভিকচিত্তে প্রচলিত ভাব ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই স্বাধীন চিন্তার ফলেই তাঁহারা জগতকে নূতনরূপে গড়িতে চাহিয়াছিলেন, এবং অন্ততঃ তাঁহাদের কার্য্যের ফলে বর্ত্তমান ইউরোপের অভ্যুত্থান হইয়াছে। তৎপরে উনবিংশতি শতাব্দির মধ্যভাগে ইউরোপে আবার এক নূতন চিন্তার স্রোত বহিতে থাকে, আবার ভাবরাজ্যে এক নূতন বিপ্লব সাধিত হয় এবং তাহাকে রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সফলিত করিবার জন্য চেষ্টা ও হয়। ইউরোপের এই শেষোক্ত দুই চিন্তার স্রোতের ঢেউ রুষে বিশেষভাবে লাগে। অশিক্ষিত ও জড়তাপ্রাপ্ত রুষের মস্তিষ্ক এই চিন্তাস্রোতে বিশেষভাবে আলোড়িত হয়। তথাকার মণীষিরা বিগত এক শতাব্দি ধরিয়া নিজেদের জাতীয় জীবনের সমস্ত অঙ্গগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তর্কের দ্বারা বিশ্লেষণ করেন। নানাভাবের নানাপ্রকারের দার্শনিকেরা নিজেদের জাতীয় জীবনের প্রচলিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির

সপক্ষেও বিপক্ষে স্বীয় চিন্তা নিয়োজিত করেন। শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তার ধারা গড্ডালিকা প্রবাহে আর ভাসমান না হইয়া নূতন খাতে বহিতে লাগিল। প্রখর বুদ্ধিশালী লোকেরা মৌলিক ভাবে ভাবিতে লাগিলেন, স্বজাতিকে নূতন ভাবে গঠিত করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার ফলে সমাজ জীবনে নূতন ভাব তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। সমাজের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ দেখান হইল, নিষ্পীড়িতেরা মুক্তি পাইবার জন্য সেই নব আদর্শের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহার ফলে অদ্য রুষের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

এইরূপে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে নূতন ভাব বা চিন্তার স্রোত প্রথমে কতিপয় মণীষিদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করে, পরে তাহা সমাজের অনেকের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া সাধারণের বস্তু হয়। আবার সমাজ এই নূতন ভাব গ্রহণের উপযুক্ত আধার না হইলে সে ভাবের লীলা তৎকালে প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য নবভাবের ভাবুকদের অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

ইহা হইল জগতের সমাজতত্ত্বিক নিয়ম। কিন্তু আমাদের দেশে কি দেখি? এখানে, সকলেই বলেন যে তাঁহারা এক নূতন ভারত সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী। সকলেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া এক নূতন ভারতীয় জাতি গঠনের প্রয়াসী। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখি? সেই ফ্রান্সের, রুষের ও জার্ম্মাণীর ন্যায় প্রখর রাজনীতিক, সমাজতত্ত্বিক ও আর্থনীতিক মৌলিক গবেষণা ভারতে কোথায়? সেই প্রবল স্বাধীন চিন্তা আমাদের কোথায়? সেই জীবনের সর্ব্বাঙ্গীর্ণ স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা আমাদের কোথায়? তাহার পরিবর্ত্তে আছে আমাদের ধর্ম্মান্ধতা, গোঁড়ামি, অজ্ঞতা ও হুজুগ প্রিয়তা! আমরা কোন এক সভাস্থলে লোকোন্মাদকরী বক্তৃতা করিয়া ঘন করতালীর ধ্বনি উত্থিত করাইয়া নিজেরা গৌরবান্বিত হই এবং মনে করি যে, কোন প্রকারে লোক ক্ষেপাইয়া অল্পদিনে হুজুগ দ্বারা গন্তব্য স্থলে পৌছিব—তাহা না হইলে আর আমরা আট মাসে স্বরাজ লাভ করিতে বাহির হইয়াছিলাম! আমরা ভুলিয়া যাই যে সর্ব্ব কর্ম্মের একটা ভিত্তি পত্তন করিতে হয়,

আমরা ভুলিয়া যাই যে রাজনীতি ও একটি বিজ্ঞান বিশেষ। এই সব সত্য ভুলিয়া যাই বলিয়া, আমরা সর্ব্বকর্ম্মে "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার" পদ্ধতি অবলম্বন করি ও "গোলে হরিবোল দিয়া" কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টার দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মের পশ্চাতে যে একটি অভিব্যক্তির ধারা আছে তাহা বিস্মরণ হইবার চেষ্টা করি এবং কেবল নিজেরাও আত্মপ্রবঞ্চিত হই না, সাধারণকেও মোহে নিমগ্ন করি।

বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে হুজুগ অর্থাৎ লোক ক্ষেপান দ্বারা কোন একটি পাকা কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক সমাজে নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে "হুজুগ" তোলা যাইতে পারে। ইহা মনস্তত্ত্বের কথা; মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে লোকসমাজে কতকগুলি উত্তেজনাকরী ভাবকে antisuggestion-রূপে প্রচার করিলে তাহা হিষ্টিরিয়াতে পরিণত হয় অর্থাৎ এবম্প্রকার উপায় দ্বারা লোকমধ্যে একটা স্নায়বিয়দৌর্ব্বল্যতার উদয় হয়,

তাহা ক্রমে সাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হয়। তাহা দ্বারা লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তির লোপ পায় ও আত্মনির্ভরতা প্রবৃত্তির অন্তর্ধান হয়। এই প্রকারে হুজুগের সৃষ্টি হয়। ইহার দ্বারা স্থায়ী কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। এই জন্যই আমাদের সর্ব্বপ্রকারের জাতীয় কর্ম্ম ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর আমরা তাহার ফলে হা হুতাস করিতেছি!

বর্ত্তমানে ভারতের জাতীয় জীবন সংগঠনের জন্য ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্বরাজ লাভের জন্য আমাদের সর্ব্ব কর্ম্মের পাকা ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে; অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মের দার্শনিক কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। এক্ষণে চাই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মৌলিক ভাবুকের দল যাঁহারা ভারতীয় রাজনীতি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিয়া দর্শনে পরিণত করিবেন এবং তাঁহাদের গবেষণার ফল লোক সমাজে উপস্থিত করিয়া জনসংঘকে চালিত করিবেন।

এক্ষণে অতীতের অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইবে যে হুজুগ আর নাটকীয় অভিনয়ের দ্বারা জাতীয় জীবন সংগঠিত হইবে না, এবং স্বরাজ প্রাপ্তিও হইবে না।

কিন্তু স্বরাজ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবন সংস্থাপন জন্য ধীরে ধীরে ভিত্তির ইষ্টক প্রোথিত করিতে হইবে। ফাঁকা আওয়াজ বা লোকন্মাদক ওজস্বিণী বক্তৃতা দ্বারা অল্প সময়ে স্বরাজ করতলগত হইবে না। আমাদের চাই যুক্তি, আমাদের চাই বুদ্ধি, আমাদের চাই বিজ্ঞান আর আমাদের চাই সংঘবদ্ধতা। এই স্থলেই ইউরোপীয় ও ভারতীয় কর্ম্মের প্রভেদ। ইউরোপীয়েরা সর্ব্ব কর্ম্মের অগ্রে নিজেদের গন্তব্যস্থল বা আদর্শকে বিশেষভাবে বুঝিয়া লয় ও পরে তাহা সংসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। তাহারা কেন কার্য্য করিব, কাহার জন্য করিব, কি করিব ও কি উপায়ে করিব তাহা সম্যকরূপে অনুভূতি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। "হুজুগ" তাহাদের ধাতে আসে না যদিচ অনেক স্থলে বা শেষ সময়ে mob-psychology-র

সাহায্যে লোকমত নিজের দিকে টানিয়া লয়। কিন্তু আমাদের সব বিপরীত। এই জন্যই ভারতে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠিয়া উঠিতেছে না।

তৎপর, আমাদের এই জাতীয় জীবনের ভাঙ্গা গড়ার সময়ে কর্ণধার হন, যাঁহারা এবম্প্রকার কর্ম্মে অন্য-দেশে উপযুক্ত বলিয়াই গণ্য হন না। তাঁহারা হইতেছেন আইন ও ভৈষক ব্যবসায়ীর দল। তাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির তথ্য কি বুঝেন তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে আমরা ফল দেখিয়া ইহা জানিয়াছি যে যদি ব্যারিষ্টার, উকিল ও ডাক্তারের দলদ্বারা ভারত স্বাধীন হইত তাহা হইলে অনেক দিনই তাহা সম্পাদিত হইত। এই শ্রেণী বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতকে তাঁহারা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" রাখিয়াছেন। এই সব দেখিয়া বোধগম্য হয় যে আমাদের কার্য্যের কোন এক জায়গায় নিশ্চয় গলদ আছে।

আমরা যদি জাতীয় মুক্তি চাই, যদি ভারতের লোকবৃন্দকে এক জাতীয়ত্বের ছাঁচে গঠিতে চাই, যদি

আমরা জগতের একটি জীবিত জাতি বলিয়া গণ্য হইতে চাই তাহা হইলে আমাদের পুরাতন গড্ডালিকা প্রবাহে গাত্র ঢালিয়া সুখস্বপ্ন ভাবিলে চলিবে না। আমাদের নূতন পন্থা ও গন্তব্যস্থল আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। নূতন ভাবে জগতকে দেখিতে হইবে, নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। কোন কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের এই মত যে ভারতীয়েরা যদি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত সমানভাবে মস্তিষ্কশালী হইত তাহা হইলে তাহারা নিজেদের মুক্তির উপায় নিজেরাই আবিষ্কার করিয়া লইত। আর তৎস্থানের সাধারণতঃ এই ধারণা যে ভারতীয়েরা অতি নীচজাতি যাহাদের জাতীয় কার্য্যকরি শক্তি (race capacity) অতি হীন। অতএব ইহাদের এ জগতে উত্থান করিবার সুযোগ অতি কম। বহির্জগতের এই ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ও আমাদের অন্তর্নিহিত জাতীয় কার্য্যকরি শক্তিকে প্রস্ফুটিত করিয়া শতমুখে তাহাকে কর্ম্মে লাগাইবার জন্য প্রখর বুদ্ধিশালী ও ভাবুক লোকদের জাতীয়

জীবনের সমস্যা নিরাকরণের উদ্দেশ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইতে হইবে। এ সংগ্রামকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিতে হইবে, লোককে এক নূতন দার্শনিক আদর্শ দিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রথমে চিন্তারাজ্যে এক প্রবল বিপ্লব সাধন করিতে হইবে।]

আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

গয়ায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৈঠকের পর হইতে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসে দুইটী মতের আবির্ভাব হইয়াছে। একদল পুরাতন অসহযোগী আন্দোলন মতের সমর্থন করেন, এবং অন্য দল নূতন প্রকার কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিতে চান। এই মতভেদ লইয়া দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গন্তব্য পথ সকলেরই এক, কেবল প্রণালী লইয়া দলাদলি। সুতরাং এ প্রকার দলাদলিতে দোষ দেওয়া যায় না। বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে
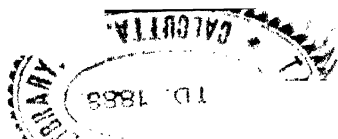
পৌঁছাইবার জন্য নানাপ্রকারের ও নানা প্রণালীর উপায় গ্রহণ করিতে হয় ; একটিতে অকৃতকার্য্য হইলে অন্য পথ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যেখানে একটী প্রণালীকে চিরস্থায়ী করা হয় বা গন্তব্যের পদে অভিষিক্ত করা হয়, সেইখানেই সেই পন্থার বা মতের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী আমাদের ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রণালী ও লক্ষ্যকে মিশাইয়া ফেলিতেছি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা আনাইয়া ফলে বিড়ম্বনা লাভ হইতেছে।

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হইতেছে স্বরাজ। কিন্তু এই স্বরাজের অর্থ ও তাহার স্বরূপ কি কংগ্রেস তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন না। যাঁহারা স্বরাজের অর্থ "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" নির্দ্ধারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা পরাজিত হইলেন এবং প্রতিবাদীরা "গান্ধি মহারাজের জয়" বলিয়া কংগ্রেসমণ্ডপ মুখরিত করিলেন। কিন্তু এই resolution কি গান্ধী মহারাজের অবমাননা সূচক ? যদি ধরা যায় যে মহাত্মাজী "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" চান না, তাহা হইলে দেশের আর কেহ কি চাহিবেন

না ? আর যদি কেহ চান, তবে তাহাতে কি মহাত্মার অসম্মান করা হয় ? ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্র কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। আসল কথা এই যে, প্রাচ্য জাতিসমূহের যাহা চিরন্তন দোষ অর্থাৎ আমরা Principle ও personality এই দুইটী ব্যাপারকে এক করিয়া ফেলি, তাহা এ স্থলেও ঘটিয়াছে। ভারতের "সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবাদ" শ্রেষ্ঠ কি মহাত্মাজীর "সহিষ্ণু অসহযোগীতাবাদ" শ্রেষ্ঠ, ইহা লইয়া যখন বিচার হইল তখন শেষে দেখা গেল যে লক্ষ্যের চেয়ে প্রণালীটীকে সাধারণে শ্রেষ্ঠ মনে করেন! ইহার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে ? আমাদের দেশের অভ্যাস যে লোকে ভগবান পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময় অবতার বা প্রতীক্‌কে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলে। তাই সাধারণে গন্তব্য স্থলকে ভুলিয়া রাস্তাকে বড় বলিয়া ধরিয়াছে। স্বরাজ—যাহার অর্থ স্বাধীনতা, তাহা বড় কি গান্ধীবাদ বড় ?—ইহার বিচার যখন হইল, তখন দেশের লোকে শেষোক্তকে বড় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন।

কিন্তু এ অন্ধ বিশ্বাস বা অবতারবাদ চিরকাল ভারতবর্ষে থাকিবে না। দেশে একদল লোক আছেন এবং যাহাদের দল ক্রমাগতই বাড়িতেছে, তাঁহারা স্বরাজ অর্থে "সাম্যবাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" বুঝেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই স্বরাজ কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? অসহযোগিতা একটা প্রণালী মাত্র, Council-এ ঢুকিয়া তাহা ভাঙ্গা—আর একটী প্রণালী মাত্র। শেষোক্ত প্রণালী Irish সিন্‌ফিনেরা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে কমুনিষ্টরা অবলম্বন করিতেছেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটী প্রণালী হইতেছে যে যখন বাহির হইতে কোন দ্রব্য ভাঙ্গা সহজ হয় না, তখন ভিতরে ঢুকিয়া তাহার কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করিবার চেষ্টা করা উচিত। সময়ে সময়ে দুই প্রণালী এক সঙ্গেই অবলম্বন করা অনুচিত হয় না। সেই জন্য দেশবন্ধু দাশের বর্ত্তমান মতটা ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসংলগ্ন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিসমোল্লায় গলদ! অসহযোগিতাকে ধর্ম্মাসনে বসান হইয়াছে,—

৩

তাহার বদলে অন্য কিছু করা অধার্ম্মিকের কর্ম্ম! প্রথমেই রাজা দুর্য্যোধনের ন্যায় এক প্রকাণ্ড প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা হইতে নড় চড় হওয়া অসম্ভব।

আসল কথা এই যে, আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতার দ্বারাই চালিত হই, সেইজন্য বিড়ম্বনার উদ্ভব হয়। আমরা ভাবপ্রবণতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া হুজুক তুলিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে যাই, সেই জন্য আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। নিজেদের দেশের সমাজে যে সব সমাজ-তত্ত্বী ও অর্থ-নীতি সংক্রান্ত স্রোত চলিতেছে ও তজ্জন্য যে সব সমস্যা উঠিতেছে জগতের রাজনীতিকেরা তাহার মীমাংসা করিবার জন্যই রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজ জগতের কোন এক অংশকে অন্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আজ সমস্ত জগৎ নানাপ্রকার আন্তর্জাতিক সূত্রে বদ্ধ। কিন্তু আমাদের চেষ্টা হইতেছে ভারতকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করা। ইহা হিন্দু জাতির এক পুরাতন রোগ। এক সহস্র বৎসর
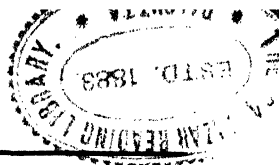
পূর্ব্বে গজনীর মামুদের সভায় ইতিহাস লেখক আল-বেরুনি এই দোষ দেখিয়াছিলেন ও তাহার সমালোচনাও করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালের ভারতীয়েরাও সে দোষে আক্রান্ত এবং তাহার নিরাকরণ করিতে কিছু মাত্র প্রস্তুত নন।

ভারতীয় নেতারা ভারতের রাজনীতিকে সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন নাই এবং তাহা করিবার জন্য কোন চেষ্টাও দেখা যাইতেছেনা। আমাদের রাজনীতি কেবল হাওয়ায় হাওয়ায় চলিতেছে। "স্বরাজ" "খেলাফৎ" "খদ্দর" "চরকা" কেবল ভাবের কথা মাত্র। ইহার দ্বারা আমাদের একজাতীয়তা পাইবার যে প্রধান সোপান স্বাধীনতা, তাহা পাইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা দিয়া ধর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা—একটী বিড়ম্বনা মাত্র। জগতের সর্ব্বত্র রাজনীতি অর্থনীতির উপর সংস্থাপিত। আমাদিগকেও ভাবুকতা ছাড়িয়া বাস্তব রাজনীতির কর্ম্মী হইতে হইবে।

বিগত ষাট বৎসরের ভারতীয় ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের সমাজের উচ্চতর শ্রেণীরা স্বাধীনতা-লিপ্সু-রাজনীতিক্ষেত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। তাঁহারা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কোন radical রাজনীতিক মতের পোষকতা করেন না। কাজেই তাঁহারা স্বরাজ বা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য দ্বন্দ্বের মধ্যে মাথা দিতে রাজী হইবেন না। আমাদের রাজনীতিক ক্রমবিকাশের স্থলে দেখি যে, যাঁহারা আগে "গরম" ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে "নরম" হইয়াছেন এবং যাঁহারা "নরম" ছিলেন, তাহারা এক্ষণে "রাজভক্ত" হইয়াছেন। ইহাই আমাদের রাজনীতিক মতের ইতিহাস।

তারপরে বাকী থাকে সহায়-সম্পদ-হীন চির-দরিদ্র নিরন্ন নিরক্ষর শ্রমজীবির দল। ইহারাই ভারতের বেশীর ভাগ লোক। ভারতের ইতিহাসে প্রাচীনকাল হইতে দেখি এই গণ-শ্রেণী নানা প্রকারে অত্যাচারিত এবং এক্ষণেও পদদলিত হইতেছে। অত্যাচারের ফলে তাহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাকথিত

সভ্য-শ্রেণী সমূহের অত্যাচারে মুষ্টিমেয় বিদেশী ভারত শাসন করিতে পারে! কিন্তু এই পদ-দলিত, চির-নিদ্রিত গণ-শ্রেণী শনৈঃ শনৈঃ জাগরিত হইতেছে এবং যতদূর সম্ভব আজ তাহারা দলবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন নেতা আজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ গণ-শ্রেণীর উপর নির্ভর করে। সেই জন্যই তাঁহারা গণ-শ্রেণীকে লইয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে-ছেন। কিন্তু এ কর্ম্মে আমাদের বুরোক্রেসীর দল ভয় পায়। কারণ গণ-শ্রেণী দলবদ্ধ হইলে শ্রেণী জ্ঞানে প্রণোদিত হইবে এবং তাহারা নিজে শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইবে। ইহা ধ্রুব সত্য যখন ভারতের কর্ম্মজীবির দল নিজেদের ক্ষমতা বা শক্তি বুঝিতে পারিবে তখন সেকেলে-দলের রাজত্ব শেষ হইবে। কর্ম্ম-জীবীরদল শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইলে বুরোক্রেসীর অত্যাচার আর তাহাদের সহ্য হইবে না। বাবুর দল তখন সাম্যভাব অবলম্বন না করিলে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য্য। বাবুর দষ্ মজুর চাষার দলকে

দলবদ্ধ করা ও তাহাদিগকে শ্রেণীজ্ঞান দান করাইবার বিরোধী। কিন্তু দেশবন্ধু দাশ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে আজ যদি তাহাদের দলবদ্ধ করা না হয়, কাল তাহারা হইবেই ও তখন তাহারা শ্রেণী-বিবাদ করিবে। এ কথাও সত্য যে দেশের মঙ্গল ইচ্ছুকেরা যদি আমাদের গণ-শ্রেণীকে দলবদ্ধ না করেন তাহা হইলে বাহিরের লোকে তাহা করিবার চেষ্টা করিবে। কারণ আন্তর্জাতিক কর্ম্মজীবির দল দেখিতেছে যে ভারতের মজুরদের তাহাদের দলে না টানিয়া লইলে তাহাদের মুক্তির উপায় হয় না।

ভারত-সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা। ভারতকে বহির্জগত হইতে "চৈনিক প্রাচীর" দিয়া ঘেরিয়া রাখা মূর্খতা মাত্র। জগতের শান্তি ও কর্ম্মজীবী দলের মুক্তি ভারত-সমস্যার মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্যই "বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিক গণশ্রেণী" নিজেদের লক্ষ্যকে ভারতের গণশ্রেণীর লক্ষ্যের সাথে একীভূত করিতে চায়। কারণ জগতের সমস্ত মজুরদলের একই লক্ষ্য—সামাজিক ও আর্থনীতিক মুক্তি। আমাদের

আর "ধরি মাছ না ছুঁই পাণি" করিলে চলিবে না। আমরা চাই স্বরাজ এবং এই স্বরাজ পাইবার জন্য গণসমূহকে খেপান হইতেছে। স্বরাজটা যদি বাবুর দলের জন্য হয়, তবে এই মহাপুণ্য অভিসন্ধি সফল হইবার আশা নাই। গণসমূহকে যদি স্বরাজের জন্য খেপাইতে হয় তবে তাহাদিগকে মুক্তিও দিতে হইবে। তাহাদিগকে ধর্ম্মের নামে কিছুদিন ঠকান যাইতে পারে, কিন্তু শেষে আর্থনীতিক কারণে যখন তাহাদের চমক ভাঙ্গিবে তখন তাহারা "পেট মহারাজ কি জয়" বলিবে। আমাদের নিরক্ষর গরীব "ছোটলোকদিগকে" কোন প্রকারে খেপাইয়া তাহাদের স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-ত্যাগের ফলে ইংরাজ বুরোক্রাশী তাড়াইয়া দেশী বুরো-ক্রাশী রাজত্ব করিবার যে ইচ্ছা ইহাই Nationalism-এর অভিসন্ধি। ছোটলোকদের মাথার উপর কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইব এই মতলবই জগতের সর্ব্বত্র জাতীয়তা (Nationalism) নামে অভিহিত হইয়াছে। ভারতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমাদের বর্ত্তমান ইতিহাসের গতির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা

যায় যে ভারতের স্বরাজের ভবিষ্যৎ গণশ্রেণীর উপর নির্ভর করে। যদি তাহাদিগকে জাতিপ্রেমে উন্মাদিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সামাজিক ও আর্থনীতিক মুক্তি দিতে হইবে।

ইতিহাস সর্ব্বত্র একভাবেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। ইউরোপে যে সামাজিক প্রশ্নসমূহের নির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, ভারতে হয় ত তাহার প্রয়োজন হইবে না; যদি আমরা ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করি। ভারত চিরকাল নিজের বিশেষত্ব রাখিয়াছে, সেইজন্য ভারত-সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিতে হইবে। আমাদের স্বরাজে শুধু রাজনীতিক মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিলে হইবে না সামাজিক ও আর্থনীতিক মুক্তিও প্রাপ্ত হইতে হইবে।

ভারতের ইতিহাসে দেখি যে, আমাদের রাজনীতিক পরাধীনতা, সামাজিক ও আর্থনিতিক পরাধীনতার জন্য ঘটিয়াছে। এই ব্যাধির ঔষধের জন্য ভারতবর্ষীয়দের রাজনীতিক স্বাধীনতাকে সামাজিক ও আর্থনীতিক
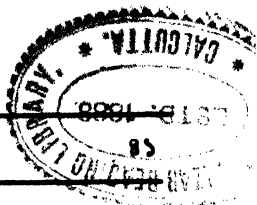
স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আমাদের পুরাতন বাবুর দলের দর্শনশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন সামাজিক ও আর্থনীতিক সাম্যবাদ গণসমূহের সম্মুখে ধরিতে হইবে। এক নূতন মহান আদর্শ গণবৃন্দের সম্মুখে ধরিতে হইবে।

আমাদের গণবৃন্দ (Mass) স্বরাজ প্রাপ্তির চেষ্টার একমাত্র আশাস্থল। অতএব স্বজাতি প্রেমিকতার একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে যে তাহাদের মনুষ্যত্ব জাগরিত করা। গণসমূহের মনুষ্যত্ব জাগাইতে হইলে, কেবল "ছুঁৎমার্গ" উঠাইয়া দিলে ও জলাচরণীয় করিয়া লইলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। তাহাদের দাবী বজায় রাখিবার জন্য তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতে হইবে ও তাহাদের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সমাজ বিজ্ঞানের Principles-এর শিক্ষা দান করিতে হইবে। কংগ্রেসে বাৎসরিক অধিবেশনে Mass Organisation-এর উপর কেবল মন্তব্য অনুমোদন করিয়াই শেষ করিলে চলিবে না। এই মন্তব্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

যে যুবকবৃন্দ দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে ব্যগ্র, তাঁহারা যেন এই কার্য্য হাতে গ্রহণ করেন। যে যুবকবৃন্দ স্বাধীনতাবাদে বিশ্বাস করেন, এই কর্ম্ম তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেকার মত গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া স্বাধীনতাবাদ প্রচার করার সময় এক্ষণে গিয়াছে, কর্ম্ম প্রকাশ্যে করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নূতন প্রণালীতে জনসাধারণের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদের কৃষক, শ্রমজীবী, ধোপা, নাপিত, চাকর ইত্যাদিকে Trades Union-এ দলবদ্ধ করিতে হইবে। এই গণ-শ্রেণীকে দলবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া দিতে হইবে ও তাহাদের ন্যায্য দাবী বুঝাইয়া দিতে হইবে। যখন আমাদের সমগ্র দেশের গণবৃন্দ দলবদ্ধ হইবে ও একটা Central Organisation-এর অধীনে কর্ম্ম করিবে, তখন অসহযোগিতা বা Mass Civil Disobedience ইত্যাদি কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা হইবে। বর্ত্তমান সময়ের স্বাধীনতা-যুদ্ধের একটা বিশেষ অস্ত্র হইতেছে Mass Action. যখন গণসমূহ একসূত্রে

বন্ধ হইয়া সমগ্র দেশব্যাপী Political Strike করিতে আরম্ভ করিবে, তখন বাবুর দলের ঘুম ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা হইবে। এই বিষয়টি ইউরোপের Mass Movement দেখিয়া যেন আমরা শিক্ষা লাভ করি। আমাদের চিরকাল ছেঁদো কথায় বা হাওয়ায় হাওয়ায় দেশ উদ্ধারের কল্পনা জল্পনা করিলে চলিবে না। এক্ষণে একদল শ্রেণীজ্ঞানবিহীন অর্থাৎ যাহাদের বাবুত্ব ত্যাগ হইয়াছে, ঐ স্বার্থত্যাগী যুবকদের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার দরকার, যাঁহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের একজন হইয়া তাহাদেরই মধ্যে কাজ করিবেন।

পূর্ব্বের ন্যায় গুপ্ত সমিতির দ্বারা স্বাধীনতাবাদ প্রচার ও রাজনীতিক ডাকাইতির দ্বারা বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থসঞ্চয় করার সময় চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহার বদলে একদল যুবক বিদেশ হইতে টাকা আনিয়া দেশোদ্ধারের আকাশ-কুসুম দেখিতেছেন। দেশের একদল নিষ্কর্ম্মা যুবক আছেন—যাঁহারা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে তাঁহাদের নির্ব্বাসিত বন্ধুরা

বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে টাকা লইয়া তাঁহাদিগকে পাঠাইবেন তবে তাঁহারা দেশ উদ্ধার করিবেন। হায় রে আকাশ-কুসুম! ইঁহাদের ধারণা যে, বিদেশে নির্ব্বাসিতেরা স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন ও অনেকেই এক একটা গবর্ণমেণ্ট হাত করিয়া বসিয়া আছেন। ইঁহারা এ কথা বুঝেন না যে বিদেশীয় টাকার দ্বারা কখনও স্বদেশ উদ্ধার হয় না। প্রত্যেক পন্থাকে (Movement) নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বিদেশীরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ২।১ জন ভারতীয়কে চাকর রাখিতে পারে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য কেহ কখনও অর্থব্যয় করিবে না। আমাদের যুবকদের হুজুক ছাড়িয়া বাস্তবিক অনুভূতি করিতে হইবে। এইজন্যই বাস্তবিক রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালাভের ফলে বলিতেছি যে, বিদেশের ভরসা নাই; দেশের কার্য্যের জন্য সাহায্য দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যদি কেহ কার্য্য করিতে পারে।

এক্ষণে স্বাধীনতার প্রকারভেদই সকলকে দিতে

হইবে এবং Mass Movement (জনসাধারণ সহ কার্য্যপদ্ধতি) আরম্ভ করিতে হইবে। যাহারা দেশের কার্য্য করিতে ইচ্ছুক তাহারা যেন বিদেশীর আশার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া Mass Movement-এ যোগদান করেন। দেশের চাষাভুষার কাছ হইতে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া, তিল কুড়াইয়া তাল করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ও Movement চালাইতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য—অন্য রাস্তা এক্ষণে আর নাই।

বাঙ্গলায় নূতন সংক্রামক ব্যাধি

দেশে এখন একটী নূতন ব্যাধি বাহির হইয়াছে—ধর্ম্মের ভেক! ইহা নাকি বড় সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! দেশে যুবকদের মধ্যে এক সময়ে স্বাধীনতাবাদ পন্থা বড়ই প্রসার লাভ করিয়াছিল, অনেক যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি এই পন্থার মধ্যে থাকিয়া সাহস, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি নানা সদ্গুণের পরিচয় দিয়া আত্মবিকাশ ও দেশের কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে ধরপাকড়ে সে সব নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে অসহযোগ আন্দোলনে অনেকে শক্তি নিয়োজিত

করেন। কিন্তু হিন্দুজাতির যাহা চিরন্তন রোগ, এই পন্থাও অনেকের কাছে এক প্রকার ধর্ম্মের আকার ধারণ করে। এক্ষণে এ পন্থাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে। একটী জাতির ইতিহাসে কোন একটি পন্থা, বিশেষতঃ রাজনীতিক পন্থা, চিরন্তন হয় না। ক্ষেত্র, সময় ও লোক অনুসারে পন্থাও পরিবর্ত্তন করে। সেইজন্য কোন একটি প্রচেষ্টা নষ্ট হইলে আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

আজকাল বঙ্গে জাতীয় শক্তি অন্য রাস্তা না পাইয়া ধর্ম্মে বিকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই জন্য দেশে ধর্ম্মের হুজুগ আরম্ভ হইতেছে। চারিদিকে নানা প্রকারের "অবতার" প্রকট হইতেছেন। অবতার প্রপীড়িত ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশে অবতারের আজ বড় বেশী প্রাদুর্ভাব। কেহ শব্দ-ব্রহ্মের সাধনা করিতেছেন, কেহ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছেন, কেহ অধমতারণ করিতেছেন, কোথাও বা পূর্ব্বকালের অবতার পুনঃ প্রকটিত হইয়াছেন, কোথাও বা হইবার আশায় আরাধনা

হইতেছে, কেহ বা জগতে চিরশান্তি আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইত্যাদি নানাপ্রকার অবতার এক সঙ্গে লীলা খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সব চেষ্টার মূলে এক একটি অবতার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পূর্ণাবতার, কেহ বা খণ্ডাবতার, কেহ বা সপ্তম গোস্বামী, কেহ বা জগদ্‌গুরু কেহ বা আর এক ধাপে উঠিলে পূর্ণাবতার ডিপ্লোমা পাইবেন ইত্যাদি। অর্থাৎ, শত্রুপক্ষ দেশে যে অবস্থাটি চাহিয়াছিল, সেই অবস্থাটি আপনাআপনি আসিয়াছে বা আসিতেছে। ভারতবর্ষের মতন জড়ভরত আহম্মক দেশ ধর্ম্মের হুজুকে মাতিয়া থাকুক, অবতার লইয়া মাতিয়া থাকুক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক মুক্তির প্রশ্নটা তাহারা ভুলিয়া গিয়া অধ্যাত্মিক মুক্তির বিষয়ে জীবন নিমগ্ন করুক, ইহাই বৈদেশিকদের আন্তরিক ইচ্ছা। আর হতভাগ্য ভারতের মতন দেশে আধ্যাত্মিক মুক্তির চেষ্টার ন্যায় অন্য আর সোজা চেষ্টা কি আছে? উর্ব্বরা ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশে, জীবন ধারণের জন্য বিশেষ কোন কষ্ট বা চেষ্টার প্রয়োজন
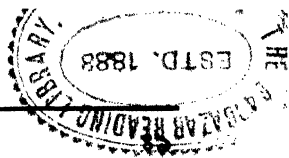
নাই। তৎপরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানাপ্রকার স্নায়ুর পীড়া ও মোহদর্শনকে ধর্ম্মের চরমাবস্থ, বলিয়া মান্য করা হয়। বিশেষতঃ বেশীর ভাগ লোক এখানে অশিক্ষিত। কাজেই তাহারা ধর্ম্মতত্ত্বের সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য বাজে হুজুকে ভুলিয়া পৌরহিত্যের অত্যাচার সহিয়া যাইতে থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ইহার উপর যদি সেই জাতি সামাজিক ও তজ্জন্য অর্থনীতিক গোলামিতে বদ্ধ থাকে, তবে ত সোণায় সোহাগা হয় এবং এই সব অবস্থার উপর যদি রাজনীতিক অধীনতা থাকে, তবে সে জাতির চরমাবস্থা (নির্ব্বাণ) উপস্থিত হয়। ভারতবাসীর প্রায় সেইরূপ চরমাবস্থা বহুদিন উপস্থিত হইয়াছে। এই যে ধর্ম্মের ঢেউ দেশে চলিতেছে, ইহা সুলক্ষণ নহে। একটি শক্তিশালী উদীয়মান জাতির কখন এই প্রকার সাধারণ জ্ঞানের (Commonsense) অভাব হওয়া উচিত নহে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, রোম কর্ত্তৃক প্রপীড়িত ও জাতীয় সংগ্রামে পরাজিত ইহুদি জাতি পরস্পর মিশিয়া যাইবার অপেক্ষায় ছিল।

রোম কর্তৃক পরাজিত গ্রীক জাতি Stoicবাদ, মিত্র-ধর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার মতবাদের আশ্রয়ে থাকিয়া নিজেদের পরাধীনতার দৈন্যকে লুকাইত করিবার চেষ্টা করিত। শেষে রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত পরাজিত জাতি ও শ্রেণীসমূহ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত খাটে না। ভারতে ও মুসলমান যুগের মধ্যকালে ধর্ম্মের প্রবাহ সমগ্র ভারতে বহিয়াছিল। এই সব পন্থা তখন হিন্দুকে নানাপ্রকারে জেতৃ ইসলাম ধর্ম্মের সাথে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিত। কেহ হিন্দুকে শক্তিশালী করিবার বা পুনঃজীবিত করিবার ব্যবস্থা করে নাই। উপস্থিত যুগের এই ধর্ম্মের হুজুগের সামাজিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া দিয়া মনঃস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যত প্রকার ধর্ম্মের হুজুগ দেশে উঠিতেছে, ইহা রুদ্ধ জাতীয় শক্তির রূপান্তর মাত্র। সমগ্র জাতির ইতিহাসে ইহা দেখা যায় যে, নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনীতিক কষ্টের কারণে সমাজে যখন

একটি ধর্ম্ম-হুজুগের ঢেউ উঠে, তখন হিষ্টিরিয়া, হালুশিনেশান, অবতার বা Messageএর প্রতীক্ষা. প্রলয় বা সৃষ্টি-ধ্বংস, পরলোক হইতে সংবাদ ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়। তারপর লোক-সমূহ প্রকৃতিস্থ হইলে এই সব হুজুগ চলিয়া যায়।

দেশের শক্তি এক্ষণে অসংযত অবস্থায় রহিয়াছে, অসহযোগ আন্দোলনও লোকের ধর্ম্মোন্মত্ততা বাড়াইয়া দিয়াছে, কাজেই দেশে এক্ষণে নানাবিধ উদ্ভট অনুষ্ঠানের উদ্ভব হইবে। আজ দেশের শক্তিকে যথার্থ রাস্তায় লইয়া যাওয়া হইতেছে না বলিয়াই অধমতারণ খণ্ডাবতার ও পূর্ণাবতারের ঝগড়া চলিতেছে। এই সব সামাজিক হিষ্টিরিয়ার একমাত্র ঔষধ লোকদের একটি "বহুজন হিতাচ" কর্ম্মে লাগাইয়া দেওয়া ও জনহিতকর আদর্শ দেখান। দেশের ধার্ম্মিক দলের কাছে এই কথাটা মিষ্ট লাগিবে না, এবং বলিবে এ লোকটা পাষণ্ড। কিন্তু বলি ভাই অবতার! তুমি দেশের কত লোককে জলাচরণীয় করিয়া "শব্দের" নাম শুনাইয়া মুক্তিদান করিবে? তুমি সেই হত-

ভাগ্যকে মুক্তি না দিয়া তাহার বন্ধন যে আরও শক্ত করিয়া দিতেছ! তাহাকে আরও অজ্ঞতায় ও অধীনতায় ডুবাইতেছ। আর তুমি নিজে কি মুক্ত? তুমি নিজেই যে পরোপোজীবি ও বদ্ধ!

ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা জনসাধারণকে ব্যবহার (Exploitation) করে। ধর্ম্মের নামে তাহাদের নিজেদের অধীন করিয়া রাখে। ধর্ম্মের অধীনতার সঙ্গে সামাজিক অধীনতা আছে; সামাজিক অধীনতা আসিলে আর্থনীতিক অধীনতা আসে। ইহার ফলে রাজনীতিক পরাধীনতা অনিবার্য্য। ভারতবর্ষে এই প্রকারেই পরাধীনতা আসিয়াছে। এক্ষণে "আমলাদলের" সাথে ঝগড়া করিলেও মুক্তি-লাভ হইবে না, এবং ধর্ম্মের হুজুগেও মুক্তিলাভ হইবে না। চাই সার্ব্বজনীন মুক্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খল যদি কাটীতে চাও তবে সার্ব্বজনীন মুক্তির পতাকা গ্রহণ কর। যে ব্যক্তির মন মুক্ত নয়, সে ব্যক্তি কি প্রকারে "আধ্যাত্মিক" মুক্তির কথা বলে?

এই ধর্ম্মের হিষ্টিরিয়া দেখিয়া আমাদের হতাশ

হইবার কোন কারণ নাই। দেশের আপামরকে মুক্তির বাণী শুনাইতে হইবে। যিনি মুক্তির বাণী ঘোষণা করিবেন, তাঁহাকে স্বয়ং মুক্ত হইতে হইবে। এই সত্যটা আমাদের যুবকেরা বা স্বাধীনতাবাদীরা এক্ষণেও বুঝিতেছেন না। সেই জন্য সামান্য ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হইতেছে।—নীচতা, অহমিকা ও দলাদলিতে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। আমাদের মুক্তেচ্ছু লোক বা সেবকদের গন্তব্যপথ ও গমন প্রণালী ঠিক করিতে হইবে আদর্শকে কখন ক্ষুদ্র করা যায় না;—পন্থা কঠিন হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বঙ্গের বা ভারতের জাতীয় জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের ভাবিবার সময় আসিয়াছে আমরা কেন অকৃতকার্য্য হইয়াছি? কিসের অভাব? কি চাই? কি প্রকারে পাইব ও কাহার জন্য চাই? হুজুগের কাল চিরদিন থাকে না। আসলটাকে ধরিতে হইবে। আমরা চাই মুক্তি, তাহা আধাআধি করিলে চলিবে না। জাতীয় জীবনে মুক্তি

চাই ! কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, জাতি কে ? দেশের মুষ্টিমেয় বাবুরদল জাতি নয়। শতকরা নিরনব্বই জন নিরক্ষর পতিতেরাই জাতি, তাহারাই "গণ"। তাহাদের মুক্তির চেষ্টা করিলে শুধু রাজনীতিক পরিবর্ত্তন নয়, সামাজিক মুক্তিও তাহাদিগকে দিতে হইবে। বিদেশী আমলাদের হাত হইতে তাহাদিগকে দেশী আমলাদের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাদের আর কি উন্নতি হইবে ? আমাদের যেন ইহা মনে থাকে যে জগতের মনুষ্যজাতির এক পঞ্চাশ ভারতে বাস করে। ইহারা নানাবিধ অত্যাচার ও বন্ধনের আশীবিষে জ্বলিতেছে। যদি ইহাদের সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করা না হয়, তবে মনুষ্যজাতিরই বিশেষ ক্ষতি। এক্ষণে কোন কোন বৈদেশিকেরা একথা বুঝিতেছেন।

যাঁহারা আমাদের পয়গম্বর হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা এ সব সত্যের খবর রাখেন না। সেই জন্যই আমাদের সর্ব্ব কর্ম্ম পণ্ড হইতেছে। আমাদের দেশে একদল যুবক চাই, যাঁহারা যুক্তিবাদের বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, যদি মুক্ত হইতে চাও,

তবে নিজের মনকে আগে মুক্ত কর। নিজেকে সর্ব্ব প্রকারে মুক্ত হইতে চেষ্টা কর। যখন দেশের যুবকদল এক নূতন আদর্শ পাইবে ও কার্য্যে নামিবে, যখন দেশের সকলে নূতনবাণী শ্রবণ করিবে ও তাহার সাধনে চেষ্টা করিবে, তখন দলাদলি আত্মকলহ ও অবতারের উৎপাত ও সাময়িক হিষ্টিরিয়ার তিরোধান হইবে।

পাঠাগারের ইতিহাস

সাধারণতঃ বঙ্গভাষায় য়ুরোপীয় শব্দ "লাইব্রেরী" অর্থে পুস্তকালয় বা পুস্তকাগার বুঝায়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এবম্প্রকারের পাঠাগারের উদ্দেশ্য কি? নানাপ্রকারের শিক্ষণীয় পুস্তক যাহা ব্যক্তি বিশেষের কাছে থাকা সম্ভব নহে তাহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগারে সংগৃহীত থাকে, উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা। বিদ্যা লোক-সমাজে নানাপ্রকারে বিস্তারিত হয়, উহা কেবল বিদ্যালয়ের গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকেনা। বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, শিক্ষার্থী নিজের জীবনের
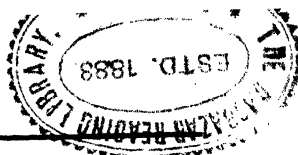
সমস্ত..কর্ম্মকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ না ভাবিয়া সর্ব্বাঙ্গীনভাবে দেখিতে পারে। বর্ত্তমানের বিদ্যালয়সমূহ, বিশেষতঃ এদেশে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে একদর্শিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, জীবনের সর্ব্বদিককে দেখাইবার পন্থা নাই।

অতএব বিদ্যালয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না বা লাভ করা সম্ভব নহে, অন্যত্র তাহা পরিপূরণ করা প্রয়োজন। এজন্য উচ্চশিক্ষা বিস্তার হেতু এমন প্রকারের পন্থা সমূহ লোক-সমাজে প্রচারের প্রয়োজন, যাহাতে উক্ত প্রকারের অভাব পরিপূরিত হইতে পারে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার এবম্প্রকার একটি পন্থা। পাঠাগারের শিক্ষার্থীকে উহার বিদ্যা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তথায় যাইয়া নিজের শক্তি, হয়ত অর্থ এবং সময় নিয়োজিত করা প্রয়োজন। তাহার নানা-প্রকারের উচ্চ-চর্চ্চার পুস্তক পাঠ করার প্রয়োজন। পৃথিবীর নানা-প্রকারের সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে, তাহার মন উন্নত হইবে এবং নিজের কর্ম্মকে বোধগম্য করিতে পারিবে।

এক্ষণে এস্থলে বিবেচ্য, পাঠাগার অর্থাৎ "লাইব্রেরী" কাহাকে বলে? ইহা কেবল পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠের স্থল নহে। ইহার পুস্তকাবলী যথায় রক্ষিত হয়, যে তাহার হিসাব রাখে,—ইমারত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ "লাইব্রেরিয়ান" এই সকলের সমষ্টিকে পাঠাগার বা লাইব্রেরী বলে। এ বিষয়ের শেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, পাঠাগারের ভিত্তি হইতেছে সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকাবলী। কিন্তু কথা হইতেছে, পুস্তক কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে মনের চিন্তা নানা-প্রকারের শব্দের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই পুস্তক; পুস্তক দ্বারা উচ্চ-চর্চ্চা, বিজ্ঞান আবিষ্কার প্রভৃতির সংবাদ লোক-গোচরীভূত হয়। এই উপায়ে উচ্চশিক্ষা লোকমধ্যে প্রচারিত হয় এবং সভ্যতাও বিস্তৃতিলাভ করে।

এইজন্য পাঠাগারের বা সংগৃহীত পুস্তকাবলীর আগার আবহমান সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সাধারণের শিক্ষার জন্য এবম্প্রকারের পাঠাগারের স্থাপন প্রথা অতি প্রাচীন। কিংবদন্তী অনুসারে এই তথাকথিত প্রাচীন পাঠাগার নানা-প্রকার—যথা, দেবতাদের—আদমের পূর্ব্বেও তাহার সমসাময়িক পাঠাগার; জলপ্লাবনের পূর্ব্বের জননায়কদের পাঠাগার; এবং আমাদের প্রাচীন চলমান পাঠাগার—বেদ। এবম্প্রকারের তথাকথিত ও কল্পিত প্রাচীন পাঠাগারের বিস্তৃত তালিকাও বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে আদম হইতে নোয়া পর্য্যন্ত যত জননায়ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সময়ের তথা কথিত পাঠাগার সমূহ "প্রাচীন" নামে অভিহিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে তুলনামূলক মনস্তত্ত্ব (Comparative psychology) ও তুলনামূলক প্রাচীন গল্প (Comparative mythology) সমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমাদের পূর্ব্বেও এই প্রকারের পাঠাগার ছিল। ব্রহ্মা, ওডিন (Odin), থথ্ (Thoth) এবং যে সব দেবতা জ্ঞান স্বরূপ বা শব্দস্বরূপ বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন, প্রাচীন গল্পে,

তাঁহাদের অনেক সময়ে পাঠাগারের প্রতিমূর্ত্তী বলিয়া কল্পিত করা হয়।

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও ওডিনের পাঠাগারে বিশেষ বিখ্যাত। ব্রহ্মার পাঠাগার বেদ ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ইহা নাকি সর্ব্ব-জ্ঞাতা ব্রহ্মার স্মৃতিতে প্রথমে আবদ্ধ ছিল। মনস্তত্বের বিচারের রাস্তা দিয়া আমরা স্মরণশক্তির উৎপত্তি স্থলে পৌছাই এবং ইহাই মানবের স্মৃতি। পুস্তক ও স্মৃতি পাঠাগারের যথার্থ তথ্য শিক্ষা করিতে সাহায্য করে। আবার এই রাস্তা দিয়াই আমরা সঙ্কেত ভাষার প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ হই। এই সঙ্কেতই হস্তলিখিত পুস্তকের উৎপত্তি স্থল।

এই প্রকারের বিচারে আমরা জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে উপনীত হই। জ্ঞানকে বিকীর্ণ করিবার জন্য পুস্তক হইতেছে তাহার আধার। সর্ব্বদ্রব্যেরই প্রারম্ভ অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় সংঘটিত হয়, পরে অতি উৎকৃষ্ট ও উচ্চদ্রব্য স্বভাবতঃই অতি জটিলাকার ধারণ করে। জীবজগতের সঙ্কেত ভাষা অভিব্যক্তি দ্বারা মানবের উচ্চশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয় এবং একটি

কোন ভাষায় তৎভাষীদের সর্ব্বপ্রকারের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়া তাহাদের সভ্যতার নিদর্শন প্রকট করে।

পুঞ্জীকৃত মানব অভিজ্ঞতা হইতেছে সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই পুঞ্জীকৃত মানব-সভ্যতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে সাহিত্য। যে ভাষায় যত প্রকারের মানব-অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, সেই জাতির কীর্ত্তির নিদর্শন ততই প্রকৃষ্ট। এই লিপিবদ্ধ মানববুদ্ধির কীর্ত্তির বিবরণী যথায় বসিয়া পাঠ করা হয়, তাহাকেই পাঠাগার কহে। পাঠাগারের ইহাই গৌরবের বিষয় যে, সভ্যতার উন্নতির জন্য এই প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলি তাহার অত্যাবশ্যক যন্ত্র স্বরূপ কার্য্য করে।

এই জন্যই সভ্য মানবজাতি সমূহ চিরকাল পাঠাগারের সমাদর ও স্থাপনা করিয়া আসিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, যে জাতি যত পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে, সে জাতির সভ্যতার দাবীও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাবিলনের ইষ্টকে লিখিত পুস্তকের পাঠাগার, মিশরে টলেমীদের জগদ্বিখ্যাত পাঠাগার ও

তৎপরে গ্রীস ও রোমের এবম্প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলি, মধ্যযুগে মুসলমান দেশসমূহের পাঠাগারগুলি, প্রাচীন চীনের হানরাজবংশের পাঠাগার—এই সব তৎতৎ জাতির সভ্যতার মাপকাঠিরূপে ইতিহাসে সাক্ষ্যদান করিতেছে। আর আমাদের ভারতবর্ষেও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল না। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর পাঠাগারের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু এবম্প্রকারের বহু-সংখ্যক পাঠাগার—যাহার দ্বার বিদ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল—নিশ্চয়ই এদেশে ছিল। তৎপরে জয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে এমন অনেক সংস্কৃত পুস্তকের পাঠাগার আছে, যাহাতে মোক্ষমুলারের অনুমানে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত পুস্তক সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে।

পাঠাগারের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্যের বিষয় এতক্ষণ আলোচিত হইল। কিন্তু পাঠাগার কি প্রকারে পরিচালিত হইবে, তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। একটি ঘর ভাড়া করিয়া, কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া খাতা খুলিয়া বহি পড়িতে দিলেই পাঠাগারের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সফল হয় না। কি প্রকারের বহি
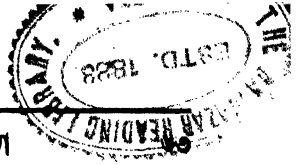
সংগ্রহ করিতে হইবে ও তাহা কোন শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে ও কি উপায়ে তাহা তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, ইহা সহজ কর্ম্ম নহে। বর্ত্তমান জগতের বড় বড় পাঠাগারের পরিচালকরা অতি বিদ্বান ব্যক্তি বলিয়া শিক্ষিত মণ্ডলীমধ্যে পরিজ্ঞাত আছেন। যথা, নিউইয়র্কের সাধারণ পাঠাগারের পরিচালক যিনি, তিনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তৎপরে একটি বড় পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগে তৎবিভাগীয় চর্চ্চার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন— যথা বার্লিনের সাধারণ পাঠাগার। এই বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা অনেক স্থলে অধ্যাপক রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। যথা, বার্লিন পাঠাগারের, সংস্কৃত বিভাগে সংস্কৃত অধ্যাপক Dr. Nobel এবং আরবী বিভাগে আরবীভাষাবিৎ Dr. Weir এবং ইতিহাস বিভাগে এবম্প্রকারের একজন লোক নিযুক্ত আছেন। পাঠার্থি তাঁহাদিগের নিকট যাইলে তাহার কোন বিষয়ের পাঠের জন্য কি পুস্তক পাঠ করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে নূতন কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে,

এই প্রকারের নানাবিধ সংবাদ তাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে পুস্তক সমূহকে তালিকাভুক্ত করাও বৃহৎ ব্যাপার। এ বিষয়ে আমেরিকায় দুই প্রকারের রীতি প্রচলিত আছে, তথায় পুরাতনটি Decimel System রূপে নূতন প্রথাটি Alphabetical Order System-রূপে অভিহিত হয়। আবার জার্ম্মাণী সুইডেন প্রভৃতি দেশে একই পাঠাগারে দুইপ্রকার উপায়ে পুস্তককে তালিকাবদ্ধ করা হয়; যথা প্রথমে একটি পুস্তককে তাহার বিষয়ানুযায়ী বিশেষে তালিকায় উল্লিখিত করা হয়, ইহাকে fact catalogue বলে এবং আবার নামানুসারে alphabetical হিসাবেও উল্লিখিত করা হয়। জার্ম্মাণীর এই প্রথাতে পুস্তক সহজেই বাহির করা যায়।

সর্ব্বশেষে পাঠাগারের কর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালনার জন্য আমেরিকায় "Library School" সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় যাঁহারা পাঠাগার পরিচালনার কর্ম্মকে অথবা সেই প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম্মকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিতে

চাহেন, তাঁহারা তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা করেন। এই পাঠাগার বিদ্যালয়স্বরূপ প্রতিষ্ঠান বিগত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে সৃষ্ট হয়। তথায় কি প্রণালীতে লাইব্রেরী Research অর্থাৎ পাঠাগারের সংগৃহীত পুঁথীসমূহ পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহাই হইল মোটামুটি পাঠাগার তত্ত্ব। এক্ষণে কথা হইতেছে, পাঠাগারের উদ্দেশ্য কি করিয়া সফল করা যায়? প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করাই পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার জন্য নানাপ্রকারের পুস্তকাবলীর সংগ্রহ প্রয়োজন এবং তাহা যাহাতে সহজ উপায়ে লোকমধ্যে পাঠ্যসাধ্য হয়, তাহার চেষ্টার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। প্রথম উপায় যাহা য়ুরোপ ও আমেরিকায় নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক বড় সহরে একটী করিয়া বৃহৎ পাঠাগার সংস্থাপন, লোক তথায় গিয়া বহি ও সংবাদপত্রাদি বসিয়া পাঠ করিতে পারে অথবা জামিন

দিলে পুস্তক গৃহে আনিতে পারে। য়ুরোপের এই সব পাঠাগার, শাসন-বিভাগ দ্বারা স্থাপিত এবং অনেক দেশে ইহা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে ধনীপ্রধান আমেরিকাতে আন্‌ড্রুকারনেগির ন্যায় নাগরিকের বদান্যতায় প্রত্যেক সহরে সাধারণের পাঠার্থ এবম্প্রকারের একটি করিয়া পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সব পাঠাগার বিশ্ববিদ্যালয় বা গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট নহে। এইরূপ পাঠাগারে স্বদেশীয় ভাষায় অনূদিত সর্ব্ব বিষয়ের ও সর্ব্বদেশের সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারাও অবসর মত এই সব স্থান হইতে বিভিন্ন পুস্তকাদি লইয়া পড়িতে পারেন ও নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারেন।

ইহা ব্যতীত য়ুরোপের মহাদেশে প্রত্যেক সহরের পল্লীতে ও ক্ষুদ্র গ্রামেও ছোট ছোট পাঠাগার আছে, তথায় কিঞ্চিৎ টাকা জমা দিয়া লোকে পুস্তক গৃহে আনিয়া পড়িতে পারে। অবশ্য এই সব পাঠাগারে সাহিত্য সম্বন্ধীয় পুস্তকই থাকে। উল্লিখিত এই দুই-

প্রকারের পাঠাগারকে ইংরাজীতে Circulating Libray বলে, তৎপরে এই সঙ্গে আর একটী পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ইহাকে Travelling Library System বলে। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে একশত বৎসর অগ্রে প্রচলিত হয়, আমেরিকায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত করা হয়; নিউইয়র্ক ষ্টেট সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্ব্বপ্রথমে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে, পরে সর্ব্বত্রই তাহা প্রচলিত হয়। এক্ষণে এই পদ্ধতি প্রচলনের বিষয় আমেরিকা সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আর ভারতবর্ষের মধ্যে বরদা রাজ্যে আমেরিকার নকল করিয়া তাহা প্রচলিত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি বড় সহরের কেন্দ্র-পাঠাগার হইতে বিভিন্ন গ্রামে লোকের পাঠের জন্য ধার দেওয়া হয়। কোন গ্রামের কোন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় ক্ষুদ্র পাঠাগার আবশ্যক পুস্তক ধারের জন্য বৃহৎ কেন্দ্রস্থলে কোনও বিশ্বাসী লোকের জামিন দিয়া আবেদন করিলে একটি বাক্সে ১৫-৩০ খানি পুস্তক পূরিয়া পাঠাইয়া দেওয়া

হয়। ইহার দ্বারা অতি দূর ও ক্ষুদ্র গ্রামের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করে। বরোদা রাজ্যের পাঠাগার বিভাগ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতি প্রচলন করে। বরোদারাজ পাশ্চাত্য দেশের পাঠাগার পদ্ধতির উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া এক পাঠাগারের Mr. William Alanson নামে কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিতে এই প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের জন্য স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। এক্ষণে ভারতের কোন কোন সমিতি এই Travelling Library-র উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রচলিত করিতেছে। এই পদ্ধতি প্রত্যেক শিক্ষিত সামাজিক কর্ম্মীর নিকট আদৃত হয়। কারণ, এই সস্তা ও সহজ উপায়ে দূরস্থিত লোকের নিকট শিক্ষার উপকরণ উপনীত করা যায়। তৎপরে আরও দুইপ্রকার পাঠাগার আছে, যথা—Free Libray System যাহা সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত আনুক্রকারনেগী প্রতিষ্ঠিত আমেরিকায় সাধারণ পাঠাগারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। আর দ্বিতীয়টী Aided Library

System. য়ুরোপের বৃহৎ পাঠাগারগুলি এই শ্রেনীভুক্ত। এই পাঠাগারগুলি ষ্টেটের স্যহায্য লইয়া চলে। বরোদাতেও ষ্টেটের সাহাব্য লইয়া মফঃস্বল, সহর, গ্রামে সর্ব্বত্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এবম্প্রকারে পৃথিবীর সর্ব্ব সুসভ্য দেশে জন-সাধারণের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মানবজাতি যে প্রকারে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিতেছে, তাহার সভ্যতাও যে প্রকারে জটিলাকার ধারণ করিতেছে, তদ্রূপ চর্চ্চার অধিনায়কত্বও দুই এক জনের হস্ত হইতে বহু লোকের হস্তে যাইতেছে। প্রাচীন-কালে ও মধ্যযুগে বিদ্যাচর্চ্চা জনকতক মনোনীত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল। ভারতের তপোবনে ঋষিরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চার অধিকারী কেবল তাঁহারাই ছিলেন। তপোবনের বাহিরে যে বিপুল জনসঙ্ঘ ছিল, তাহারা সে অমৃতের অধিকারী ছিলনা। ব্রহ্মবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ লোক সমাজের মধ্যে জনকতক ছিল, আর সমস্ত দেশ

তমসাচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন মিশরেও এবম্প্রকারের বিদ্যাচর্চ্চার অধিকার মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আর গ্রীসেও তদ্রূপ অবস্থা। তথাকার দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চ্চা, তাহা Stoa এবং Academyর প্রাচীরের মধ্যে গণ্ডীভূত ছিল। জগৎ সক্রেটীস্ প্লেটো এরিষ্টটলের নাম শুনিয়াছে ও তাঁহাদের জ্ঞান-চর্চ্চাকে গ্রীসের সভ্যতার মাপকাটিরূপ জানিতে শিখিয়াছে, কিন্তু গ্রীসের জনসাধারণ কি অজ্ঞতা ও বর্ব্বরতাসহ দিন যাপন করিত তাহার সংবাদ কয়জন রাখেন? তৎপরে মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চ্চা য়ুরোপের সাধুদের মঠ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তৎকালের জ্ঞানচর্চ্চা cluny এবং clavairanty নামক মঠ (monastry) প্রভৃতির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইত এবং সেই সব স্থান হইতে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের রশ্মি বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে বর্ত্তমান য়ুরোপের সভ্যতার উৎপত্তি হয়। আমাদের ভারতে বৌদ্ধযুগেও তদ্রূপ বৌদ্ধ-জ্ঞানচর্চ্চা সঙ্ঘাবাসের ভিতর নিবদ্ধ থাকিত এবং যখন নানাকারণে সঙ্ঘাবাসগুলি

বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইল, তখন বৌদ্ধ-চর্চ্চাও ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বাঙ্গালার মধ্যযুগে অর্থাৎ মুসলমান আধিপত্যের কালে জ্ঞান মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের টোলের মধ্যে গণ্ডীভূত থাকিত। জ্ঞান এই উপায়ে গণ্ডীভূত হওয়ার জন্য তাহা লোকমধ্যে সভ্যতা-বিস্তারের অন্তরায় স্বরূপ কার্য্য করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানব-জীবনে ও মানসিক ক্ষেত্রে এক বিপুল বিপ্লব সাধিত হয়। মানব সর্ব্বপ্রকারের পুরাতন গণ্ডী ও অন্তরায় বলপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া নূতন জীবন ও নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হয়।

এই নবযুগের নবীন বার্ত্তা ঘোষণা করিল—সকল মানবই সমান, সকলেরই সমান অধিকার। এই নবীন বাণী প্রচার করিল যে, সভ্যতা ও জ্ঞানালোক সকল-কারই গৃহে সমানভাবে পৌঁছিয়া দিতে হইবে সকলকে সমান ভাবে বাড়িতে দাও, ধর্ম্মের, জ্ঞানের, সমাজের, রাজনীতি-ক্ষেত্রের আভিজাত্য ভাঙ্গিয়া দাও—অগ্রসর হও।

এই নবীনাদর্শে মাতিয়া নবীন য়ুরোপ টলটলায়মান হইয়াছিল, পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গঠিত হইল। পূর্ব্বে যাহা মুষ্টিমেয় মনোনীত ব্যক্তির অধিকাররূপে নিবদ্ধ ছিল, তাহা সকলের সম্পত্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। এই জন্যই Free Primary Education, Public Libraries, University Extension Lecture Series Circulating Free Scientific Libraries প্রভৃতি নানা লোক শিক্ষাকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারে জ্ঞানচর্চ্চা দুই এক জনের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ার জন্য লোকমধ্যে তাহা প্রচার হওয়ায় সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শের পূর্ণতা সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ যুগের বাণী বলিতেছে যে মানবকে কেবল রাজনীতিক সাম্যদিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবেনা, তাহাকে সামাজিক ও অর্থনীতিক সাম্য দিতে হইবে।

এই বাণী বলিতেছে, মানবকে পূর্ণ মুক্তি দাও। জ্ঞানের ভাণ্ডার সকলের দ্বারে সমান ভাবে উপনীত কর। সকলকে সমানভাবে বাড়িতে ও জীবন যাপন করিতে দাও। একদেশে এক জাতির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানী, ক্ষমতাশালী ও বৰ্দ্ধিষ্ণু ও কতকগুলি নিরাশ্রয়, অজ্ঞ, ক্ষমতাবিহীন লোক থাকা সমাজের ও মানবের অকল্যাণকর।

যে জাতি যত জ্ঞানালোকে আলোকিত, সে জাতি সভ্যতাস্তরে ততই উন্নীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সভ্যতার মাপকাঠী সঙ্ঘাবাস বা মঠ বা Academy-র ভিতর নিহিত নহে। একটি জাতির Curlture অর্থাৎ চর্চ্চা তাহার ভাবুকগণের জ্ঞানস্বরূপ, তাহা দ্বারা সেই জাতির ভাবুকতার উচ্চতা মাত্র পরিমিত হয়; তাহা সেই জাতির সর্ব্বসাধারণের সভ্যতার মাপকাঠী নহে। কিন্তু যখন ভাবুকদের সেই জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত হয়, অর্থাৎ যখন ভাবুকদের জ্ঞানকে সমাজের কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয় ও তাহার ফলে সাধারণের বিদ্যা, জ্ঞান, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য,

ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়, তখন সমাজের কর্ম্মে নিয়োজিত সেই জ্ঞানকে, সেই জাতির Civilisation বা সভ্যতা বলে। এক কথায় জ্ঞানচর্চ্চাকে মানবের সেবায় নিযুক্ত করাকে সভ্যতা বলে।

মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত জ্ঞানরাশিকে মানবের দৈনিক জীবনের উপকারিতার জন্য তাহার সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে, তাহা কিরূপে করা যায়? এ কথার উত্তরে বলা যায় যে, তাহার প্রথম উপায় হইতেছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নানাপ্রকারে জ্ঞান প্রচার করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের কতিপয় পুস্তক পাঠ করিলেই বিদ্যা বা জ্ঞান হয় না। জ্ঞানকে নানাস্থান হইতে নানাভাবে আহরণ করিতে হইবে এবং জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে স্বীয় সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। সাধারণের পক্ষে সহজ ও অল্প ব্যয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের একটি উপায় হইতেছে পাঠাগার। যে দেশে পাঠাগারের অস্তিত্ব যত পরিমাণে বিদ্যমান, সেই দেশে শিক্ষাও তত পরিমাণে

বিস্তৃত। পাঠাগারের বিস্তৃতি বর্ত্তমান সময়ের কোন একটি জাতির শিক্ষার মাপকাঠী। কিন্তু কেবল পাঠাগার স্থাপন করিলেই হইবেনা। মনোনীত পাঠ্যপুস্তক-সমূহ সংগ্রহ করিতে হইবে। শুধু কতকগুলি নাটক বা নভেল পড়িলেই জ্ঞানলাভ হয় না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, মানবাভিজ্ঞতার পুস্তকসমূহও পাঠ করিতে হইবে। পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক Lester, F, Ward —যাঁহাকে আমেরিকায় Father of American Sociology বলে—তিনি বলিয়াছেন যে, মানবকে উন্নতী করিবার জন্য তাঁহার মস্তিষ্কে বাল্যকাল হইতে বৈজ্ঞানিক সংবাদসমূহ প্রবেশ করাইয়া দাও। যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবের অভিজ্ঞতা-সংবাদের মর্ম্ম সাধারণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। মাথার Brain cell সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারের সংবাদ ঢুকাইয়া দেওয়া দরকার।

এই জন্য আমাদেরও জাতীয় দৈনিক জীবনে সভ্যতার সুফল ভোগ করিবার জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা

করা প্রয়োজন। আমাদের আর ধর্ম্মপ্রধান জাতি এবং ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শস্থল বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। হিন্দুজাতি মরিতে আরম্ভ করিয়াছে, জাতীয় সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ভারতীয় জাতীকে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে নূতন আদর্শে ও নূতন ভাবে গঠিত হইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ের একটী প্রধান অন্তরায় আমদের ঘোর অজ্ঞতা। আমরা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমাদের মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

শিক্ষার দ্বারা মনকে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞানচর্চ্চাকে বাস্তব ব্যবহার দ্বারা দৈনিক জীবনের সেবায় লাগাইতে হইবে, এবং জাতীয় সভ্যতাকে উচ্চাবস্থায় আনয়ন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের বিদ্যায় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; বিশেষতঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিদ্যা অতি সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ বিদ্যার পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য বাহির হইতে জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রয়োজন। উচ্চ-চর্চ্চার শিক্ষার্থীর

এ বিষয়ে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দুঃখের বিষয় উচ্চ-চর্চ্চা (Research) করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বড় ভাল লাইব্রেরী নাই।

অবশ্য ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইবে যে, আমরা নাচার, আমাদের হস্তে ষ্টেট নাই। কিন্তু তাহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। কথা এই যে, আমরা এ বিষয়ে কি করিতেছি? আমেরিকার Cornell বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক Prof. Jenks ও Columbia-র নৃ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক Prof. Boas তৎস্থানের ভারতীয় ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের Race Capacity কোথায়, তাহা দেখাও? চীন জাপান দেখাইতেছে, তোমাদের সে শক্তি ও গুণ কোথায়? আর আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তুর্কী কি ভাবে পুনরুত্থান করিতেছে। কথাটা সত্য, আমাদের নিজেদের চেষ্টায় বড় হইতে হইবে, পরে করিয়া দিবে না ও হা-হুতাশ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। নিজেদের যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে বাধা বিঘ্ন অন্তরায়রূপে কার্য্য

করিতে পারে কি? আমাদের মুক্তি আমাদের হস্তে রহিয়াছে। এই সম্পর্কে উপস্থিত ক্ষেত্রের বিচার্য্য জনশিক্ষা। ইহার জন্য আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমের ও পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণের জন্য অবৈতনিক ভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তথায় সাধারণের বিনাব্যয়ে শিক্ষার জন্য University Extension Lecture, Night School, Summer School, নানা পাঠাগার ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই সব ব্যবস্থার উপায় উপস্থিত ক্ষেত্রে না হইলেও অনেক বিষয়ের ব্যবস্থা করা আমাদের হাতের ভিতর আছে।

ক্ষুদ্র বরোদারাজ্যে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাও আমাদের সাধ্যায়ত্ত। চাই আমাদের চারিদিকে Circulating Library স্থাপন, চাই Travelling Library স্থাপন, চাই Free Library স্থাপন; এবং এই সব পাঠাগারকে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত করিয়া তাহাদের মধ্যে পুস্তকের

আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা। আর এই সব পাঠাগারে উৎকৃষ্ট দরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজন এবং স্বদেশী ভাষায় নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক পুস্তকের প্রচলন প্রয়োজন, যদ্দ্বারা সকলেই জগতের আবহাওয়া ও সংবাদ জানিতে পারে।

কিন্তু ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। হয়ত চারিদিকে State Aided Library স্থাপন বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে, কিন্তু আমাদের দেশের ধনবান্‌-গণের দ্বারা সে অভাব কতক পরিমাণে পরিপূর্ণ হইতে পারে। আমেরিকায় ধনীরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছে, Carnegi Joundation Institute, Rockfeller Institute প্রভৃতি ঐ সব ধনীদ্বারা স্থাপিত হইয়া মানব-হিতার্থ কত বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিতেছে। য়ুরোপেও তদ্রূপ। আমাদের দেশের ধনবান্‌গণ দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, লোকের হিতার্থ মুক্তহস্ত হউন। যদি আমরা

আমাদের Race-capacity না দেখাইতে পারি, নিজেদের মুক্তির উপায় নিজেরা না উদ্ভাবন করি, তাহা হইলে এজগতে বাঁচিব কি প্রকারে ?

সমাপ্ত